অজ্ঞাত রচনা

বারোয়ারি উপন্যাস

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM
2021

বারোয়ারি উপন্যাস

একুশ

অরুণের মুখে শাশুড়ীর ওই দুর্দান্ত অসুখের কথা শুনে কমলার দু' চক্ষু ছলছল করে এল। এবং বিশেষ করে সে যখন জানালে যে, জামাইবাবু নিরুদ্দেশ, হয়ত বা তিনি এখন হিমালয়ের কোন গুহার মধ্যে তপস্যায় নিযুক্ত, এবং তাঁকে একটা সংবাদ দেওয়া পর্যন্ত সম্ভবপর নয়, তখন সেই দুটি চোখ দিয়ে বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ধারা বেয়ে নেমে এল।

হঠাৎ কি কারণে যে সতীশ সংসার ত্যাগ করে চলে গেল, এ কথা মনে মনে সবাই বুঝলে, কিন্তু মুখ ফুটে কেউ উচ্চারণ পর্যন্ত করতে পারলে না।

অরুণ বললে, শুধু কি এই? ডাক্তারের কাছে শুনে এলুম, দুর্নামের ভয়ে পাড়ার কেউ শুশ্রূষা পর্যন্ত করতে রাজী নয়। একেই ত ওদের গ্রামে মানুষের চেয়ে জানোয়ারই বেশি, তার ওপর যদি এই উৎপাত হয় ত বুড়ী বেঘোরেই মারা যাবে।

কমলা আঁচলে চোখ মুছে অশ্রুরুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, হাঁ অরুণ, মা কি তবে একলাই পড়ে আছেন? মুখে একফোঁটা জল দেবারও কি কেউ নেই?

অরুণ বললে, অবস্থা ত তাই বটে,—আমাকে ত একরকম দোর ভেঙ্গেই বাড়ি ঢুকতে হয়েছিল। তবে আজ রাতটার মত একটা বন্দোবস্ত করে এসেচি, ডাক্তারবাবু তাঁর হিন্দুস্থানী দাসীটাকে পাঠিয়ে দেবেন ভরসা দিয়েছেন ।

যাক বাঁচা গেল! বলে, হরেন একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, রাতটা ত কাটুক;—ভোর পাঁচটায় একটা ট্রেন আছে। আমরা তাইতে বেরিয়ে পড়লে সকাল নাগাদ কমলাকে পৌঁছে দিতে পারবো।

ক্ষিতীশ এতক্ষণ পর্যন্ত চুপ কোরেই ছিল, মুখ তুলে বললে, কমলাকে নিয়ে যাবে? হঠাৎ ওঁকে নিয়ে গিয়ে কি সুবিধে হবে হরেন?

বাঃ—সুবিধে হবে না? সতীশ যখন নেই, তখন শাশুড়ীর সমস্ত দায়িত্ব ত এখন ওরই। তাছাড়া দেখবে কে? শুনলে ত গ্রামের মেয়েরা দুর্নামের ভয়ে বুড়ীর কাছে ঘেঁষতে পর্যন্ত রাজী নয়। কে সেবা করে বল ত?

ক্ষিতীশ লোকটি অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তিও নয়, আগাগোড়া ভেবে-চিন্তে হুঁশিয়ার হয়ে কাজ করাও তার স্বভাব নয়, কিন্তু ভিতরের একটা গোপন বেদনা কিছুদিন থেকে ওই দিকের দৃষ্টিকে তার অত্যন্ত প্রখর কোরে তুলেছিল, সে ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বললে, কথাটা ঠিক সত্যি নয় হরেন। আমার মনে হয়, তাঁর অসুখের খবর পাড়ার মেয়েরা জানেন না। কারণ, আমার নিজের বাড়িও ত পল্লীগ্রামে, সেখানে বাপের বাড়ি থেকে বৌ হারিয়ে গেলে, শাশুড়ীর জাত যেতে আমি আজও দেখিনি, এবং এই দোষে পাড়ার মেয়েরা পীড়িতের সেবা করেন না, এত বড় কলঙ্কও তাঁদের দেওয়া চলে না হরেন।

অভিযোগটা হরেনের নিজের গায়েও বিঁধল। সে লজ্জিত মুখে জবাব দিলে, বেশ ত ক্ষিতীশ, সেবা না হয় তাঁরা করতে পারেন, কিন্তু তাই বলে এত বড় একটা টাইফয়েড রোগের সেবাও তাঁরা নিয়মিত কোরে যাবেন, এত বড় বোঝাও ত তাঁদের উপর চাপানো যায় না, ভাই।

ক্ষিতীশ বললে, ওটা যে টাইফয়েড তাও নিশ্চয় বলা যায় না। অন্ততঃ একটা দিনের জ্বরকে অত বড় একটা নামের ঘটা দিয়ে না ডাকাই ভাল হরেন।

হরেন চিন্তিত মুখে প্রশ্ন করলে, তাহলে কি করা যায় বল?

এতক্ষণ পর্যন্ত অরুণ বড়দের কথায় কথা কয়নি, চুপ কোরেই শুনছিল, এবার বলে উঠলো, দিদির শাশুড়ী সকাল থেকে জ্বরে বেহুঁশ, এই আমি শুনে এসেছি, কিন্তু জ্বরটা যে কেবল আজই হয়েছে তাও ত জানিনে। হয়ত বা ক'দিন থেকে–

ক্ষিতীশ কথাটা তার শেষ করতেও দিলে না, কানেও নিলে না, বললে, তা ছাড়া একটা বড় কথা আছে হরেন। তাঁর সামান্য জ্বর হয় ত দু-চার দিনেই সেরে যাবে, কিন্তু মাঝখানে সহসা কমলাকে নিয়ে গেলে পল্লীগ্রামে কত বড় একটা সামাজিক বিপ্লবের সৃষ্টি হতে পারে, ভেবে দেখ দিকি? সতীশের মা জ্বরের ঘোরে হয়ত বলেছেন যে তিনি কমলার কলঙ্ক বিশ্বাস করেন না, কিন্তু–

কিন্তুটা ওইখানেই থেমে গেল। অরুণের মত ক্ষিতীশের নিজের বক্তব্যটাও শেষ হতে পেল না। কমলা এতদূর পর্যন্ত নীরবে শুনছিল, হঠাৎ তার কান্না যেন একেবারে সহস্রধারে ফেটে পড়ল। অশ্রু-বিকৃত কণ্ঠে সে বলে উঠলো, কিন্তু, কি ক্ষিতীশদা? আমাকে কি তোমরা এইখানেই বেঁধে রাখতে চাও? আমার শাশুড়ীর ব্যামো, তিনি কাছে নেই, আমি না গেলে কে যাবে বল ত?

ক্ষিতীশ হতবুদ্ধি হয়ে বলতে গেল, তা বটে, কিন্তু ভেবে দেখলে

কমলা তেমনি কাঁদতে কাঁদতে বললে, ভেবে কি দেখতে চাও, শুনি? কেবল ভেবে ভেবেই ত আজ আমার এই দশা করেছ। হরেনের মুখের দিকে চোখ তুলে বললে, আমি দোষ করিনি,আমার ভালর জন্যে যদি তোমরা অত ফন্দি-ফিকির না করে সোজা আমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে ত আজ হয়ত আমার ভালই হতো; তোমাদেরও আমার জন্যে এমন ভেবে সারা হতে হতো না। আমি আর তোমাদের সাহায্য চাইনে, কেবল অরুণকে সঙ্গে নিয়ে কাল ভোরেই চলে যাবো । আমার ভাগ্যে যা আছে, তা হোক, তোমরা আর আমার ভালর চেষ্টা কোরো না ।

ক্ষিতীশ এবং হরেন দুজনেই চমকে গেল। কমলাকে এমন জোরে কথা বলতে কেউ কখনো শোনেনি। ভাল-মন্দ সম্বন্ধে তার নিজের ব্যক্তিগত যে কোন মতামত আছে, আপনার দুর্ভাগ্যকে ধিক্কার দেওয়া ছাড়া, এবং তার সংশোধনের সমস্ত ভার অপরের উপর নির্ভর করা ভিন্ন সেও যে আবার মনে মনে কিছু চিন্তা করে, এ কথা তারা দুজনেই যেন একপ্রকার ভুলে গিয়েছিল।

হরেনের মুখে সহসা কোন উত্তর যোগাল না, এবং ক্ষিতীশ বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত কোরে চেয়ে রইল। কিন্তু এ কথা বুঝতে আর তাদের বাকী রইলো না যে, তাদের উভয়ের সম্মিলিত দুশ্চিন্তাকেও বহুদূরে অতিক্রম করে আর একজনের উদ্বেগ কোথায় এগিয়ে গেছে।

কমলা তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে ফেলে বললে, তোমরা মনে কোরো না ক্ষিতীশদা, তোমাদের দয়া আমি কোনদিন ভুলতে পারবো, কিন্তু আজ তোমাদের হাত জোড় করে জানাচ্ছি ভাই,—বলতে বলতেই তার দু' চোখ বেয়ে ঝরঝর করে আবার জল গড়িয়ে পড়ল, কিন্তু এবার সে-জল সে মোছবার চেষ্টাও করলে না, হাত-দুটি জোড় করে বলতে লাগল—আমার জন্যে তোমরা যে কত দুঃখ পেলে, সে আমি জানি, আর ভগবানই জানেন, কিন্তু আর একটা দিনও না। আজ থেকে আমার দুর্ভাগ্যের সমস্ত ভারই আমি নিজের মাথায় তুলে নিলুম। ক্ষিতীশদা, একদিন যেমন আমাকে তুমি পথ থেকে এনে বাঁচিয়েছিলে, আজ তেমনি আমাকে কেবল এই আশীর্বাদ তুমি কর, এর থেকেও একটা যেন কোথাও কূল পাই,—আর না তোমাদের দুঃখ দিতে ফিরে আসি!

ক্ষিতীশ চোখ ফিরিয়ে বোধ হয় তার চোখের জলটাই গোপন করলে, কিন্তু হরেন বললে, আমরা দুজনে সেই আশীর্বাদই তোকে করি কমলা, আমি বলচি এ বিপদ একদিন তোর কেটে যাবেই, কিন্তু কাল সকালে আমিও কেন তোর সঙ্গে যাইনে?

কমলা ঘাড় নেড়ে জানালে, না।

হরেন উত্তেজনার সঙ্গে বলে উঠলো, না কেন কমলা? আমি যদি তোর সত্যিকারের দাদা হতুম, তাহলে ত তুই না বলতে পারতিস নে।

তার শেষ কথাটায় এত দুঃখেও কমলার মুখখানি লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে গেল, সে অধোমুখে তেমনি নীরবে মাথা নেড়ে বললে—না।

তার এই লজ্জাটা হরেনের অগোচর রইল না। কিন্তু পরস্পরের নাম নিয়ে এই যে একটা লজ্জাকর অপবাদ, একে সে যে বিন্দুমাত্র স্বীকার করে না, এই কথাটাই সদর্পে জানাবার জন্যে হরেন তীব্রকণ্ঠে বলে ফেললে, তুই কি ভাবিস কমলা আমি মিথ্যে দুর্নামকে ভয় করি? বাবার অন্যায় শাসন গ্রাহ্য করি? আমি যাবো তোর সঙ্গে, দেখি গ্রামের কে আমার মুখের সামনে তোকে কিছু বলতে পারে। তার জবাব আমি দিতে পারবো, কিন্তু ছেলেমানুষ অরুণ পারবে না।

কমলা সজল চোখ দুটি তার মুখের পানে তুলে বললে, অরুণ পারবে না সত্যি, কিন্তু তোমারও পেরে কাজ নেই হরেনদা। আমার বোঝা আমাকে বইতে দাও, আর আমার সমস্যাকে তোমরা জটিল করে তুলো না।

হরেন বললে, গ্রামের লোকগুলোকে একবার ভেবে দেখ কমলা, সেখানে একাকী তোর অদৃষ্টে কি যে না ঘটতে পারে, সে ত আমি ভেবেও পাইনে!

কমলা যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। সে আর কথা কাটাকাটি না করে শুধু উপরের দিকে মুখ তুলে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে বললে—তিনিই জানেন। এই বলে সে হাত দুটি মাথায় ঠেকিয়ে নিয়ে কাকে যেন প্রণাম করেই দ্রুতপদে উঠে অন্য ঘরে চলে গেল।

কয়েক মুহূর্ত কারো মুখ দিয়েই কোন কথা বার হল না, সবাই যেন নিস্পন্দ হয়ে বসে রইল। খানিক পরে অরুণ বললে—আমি কিন্তু একটা সুবিধে করে এসেছি হরেনদা। জামাইবাবুর মাকে বলে এসেছি, দিদি হারিয়ে যাবার পরে অসুখ থেকে সেরে উঠে পর্যন্ত বরাবর আমার কাছেই আছেন। ঠিক করিনি ক্ষিতীশদা? অবশ্য তোমাদের নামও করেছি বটে।

হরেন বললে, দূর পাগলা! তুই ছেলেমানুষ, কলকাতায় কমলা তোর কাছে আছে, এ কথা কেউ কখনো বিশ্বাস করে? কি বল হে ক্ষিতীশ?

ক্ষিতীশ হঠাৎ চমকে উঠে বললে, হুঁ। বলেই লজ্জিত মুখে উঠে দাঁড়িয়ে একটুখানি হেসে বললে, আমার ভারী ঘুম পাচ্চে হরেন, আমি চললুম।—বলে ঠিক যেন টলতে টলতে তার নিজের ঘরে চলে গেল।

নিজের বাড়িতে তাদের কোন খেয়াল না করে ক্ষিতীশ শুতে গেল, এটা তার স্বভাবের এমনি বিরুদ্ধ যে হরেন ও অরুণের বিস্ময়ের সীমা রইল না। কিন্তু যথার্থই আজ ক্ষিতীশের এদিকে দৃষ্টি দেবার সাধ্যই ছিল না। বহুক্ষণ থেকেই সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, এত আলোচনা ও তর্কবিতর্ক অর্ধেক বোধ হয় তার কানেই যায়নি। সেখানে কেবল একটা কথাই বারংবার প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, সমস্ত প্রকাশ হয়ে গেছে, সমস্ত প্রকাশ হয়ে গেছে! তার মনের নিভৃত গুহায় যত কিছু আশা সঞ্চিত হয়ে উঠছিল, কমলার কাছে সমস্ত ধরা পড়ে গেছে, তার কোথাও কিছু আর লুকোনো নেই! তাই সে আজ ভয়ে ভীত হরিণীর মত ছুটে পালাতে চায়। আজ তার সকল যত্ন, সকল সেবা, সকল পরিশ্রম একেবারে ব্যর্থ, একেবারে নিরর্থক।

বাইশ

ক্ষিতীশদা!

কে?

আমি কমলা, একবারটি দোর খোল।

ক্ষিতীশ শশব্যস্তে দোর খুলে বাইরে এসে দেখলে, সুমুখে দাঁড়িয়ে কমলা। রাত্রির ঘোর তখনও কাটেনি, তখনো আকাশে দু'-চারটে বড় বড় তারা জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। কেবল পূবের দিকটা একটু স্বচ্ছ হয়েছে মাত্র। বারান্দার এককোণে যে লণ্ঠনটা মিটমিট করে জ্বলছিল, তারই সামান্য আলোতে ক্ষিতীশ চক্ষের নিমেষে সমস্ত ব্যাপারটা দেখে নিলে।

কমলার গায়ে আগাগোড়া একটা হলদে রঙের র‍্যাপার জড়ানো, এবং তারই অদূরে দাঁড়িয়ে অরুণ। তার ডোরা-কাটা কোটের ওপর কোমরে বাঁধা একটা আধ-ময়লা চাদর। বাঁ হাতে তার পৈতের সময়কার লাল রঙের ছাতাটি এবং ডান বগলে একটি ছোট্ট পুঁটুলি।

কেবল এতটুকুই ক্ষিতীশ দেখতে পেল। কিন্তু কমলা যখন গড় হয়ে প্রণাম করে তার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, ক্ষিতীশদা আমি চললুম, তখন আলোর অভাবেই হোক, বা চোখের দোষেই হোক, তার মুখের কিছুই আর ক্ষিতীশের চোখে পড়ল না। তার মনে হল, অকস্মাৎ একমুহূর্তে যেন সন্মুখে, পাশে, ওপরে, নীচে সমস্তটাই একেবারে মসীকৃষ্ণ হয়ে গেছে।

—আমাদের সময় হয়েছে, আমি যাচ্ছি ক্ষিতীশদা।

—যাচ্ছো? আচ্ছা—

—আমি কোথাকার কে, তবু কত কষ্টই না এতদিন ধরে তোমাকে দিলাম, এই বলে কমলা

র‍্যাপারের কোণে চোখ মুছলে।

প্রত্যুত্তরে ক্ষিতীশ শুধু জবাব দিলে, কষ্ট? কৈ, নাঃ–

–কিন্তু তোমার প্রাণবাঁচানো যেন নিষ্ফল না হয়, যাবার সময় আমাকে এইটুকু আশীর্বাদ কেবল তুমি কর ক্ষিতীশদা–এই বলে কমলা ঘন ঘন চোখ মুছতে লাগল।

ক্ষিতীশ কোন উত্তরই খুঁজে পেলে না। কিন্তু খানিক পরে হঠাৎ বলে উঠল, আশীর্বাদ? নিশ্চয়! নিশ্চয়! তা করব বৈ কি। হাঁ অরুণ, মোটরটা বলে দেওয়া হয়েছে?

অরুণ মাথা নেড়ে জবাব দিলে, হাঁ। হরেনদা ত নীচে তাতেই বসে আছেন! তিনি ইস্টিশান পর্যন্ত আমাদের পৌঁছে দিয়ে আসবেন। আপনি যাবেন না?

আমি? না ভাই, আমার শরীরটা তেমন ভাল নেই–

কমলা দূর থেকে আর একবার নিঃশব্দে নমস্কার কোরে আস্তে আস্তে নীচে চলে গেল। অরুণ কাছে এসে বললে, আমিও চললুম ক্ষিতীশদা,–এই বলে সে দিদির মত প্রণাম করতে যাচ্ছিল, কিন্তু ক্ষিতীশ সহসা সজোরে তার হাত দুটো ধরে হিড়হিড় করে টেনে তার ঘরের মধ্যে এনে ফেলে বললে, অরুণ, তোমরা সত্যি সত্যি চললে ভাই?

অরুণ অবাক হয়ে তার পানে চেয়ে রইল, প্রশ্নটা যেন সে বুঝতেই পারলে না।

ক্ষিতীশ পুনরায় বললে, কে জানে আর হয়ত আমাদের দেখাই হবে না,–আমিও আজ দুপুরের গাড়িতে পশ্চিমে চললুম ভাই।

অরুণ এ কথারও কোন জবাব দিতে পারলে না, কিন্তু বালক হলেও সে এটুকু বুঝতে পারল যে, ক্ষিতীশদার কণ্ঠস্বর কান্নার জলে যেন একেবারে মাখামাখি হয়ে গেছে।

ক্ষিতীশ প্রত্যুত্তরে আশা না করেই বললে, তুমি ছেলেমানুষ, তোমার ওপর যে কত বড় ভার পড়ল এ হয়তো তুমি জানোও না, কিন্তু ভগবানের কাছে আমি কায়মনে প্রার্থনা করি, তোমাদের আজকের যাত্রাটা যেন তিনি সকল প্রকারে নির্বিঘ্ন কোরে দেন।

এই বলে সে তার বালিশের তলা থেকে একখানা খাম বার করে অরুণের হাতে গুঁজে দিতে গেল। অরুণ হাতটা সরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে, এ কি ক্ষিতীশদা?

সামান্য গোটা-কয়েক টাকা আছে অরুণ।

কিন্তু ভাড়ার টাকা ত আমার কাছে আছে ক্ষিতীশদা।

তা থাক। তবু ছোট ভাইদের যাবার সময় কিছু হাতে দিতে হয়। এই বোলে সে অরুণের কোঁচার খুঁটটা টেনে নিয়ে তাতে বাঁধতে বাঁধতে বললে, তোমার ত কেউ বড় ভাই নেই অরুণ, তাই জানো না, নইলে তিনিও এমনি করেই বেঁধে দিতেন, দাদার স্নেহের উপহার বলে নিতে কিছু লজ্জা কোরো না ভাই! তোমার দিদি কখনো যদি জানতে পেরে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁকেও এই কথাটাই বোলো।—এই বলে সে সেটা যথাস্থানে পুনরায় গুঁজে দিয়ে হাত ধরে তাকে বাইরে এনে বললে, আর সময় নেই অরুণ, তুমি যাও ভাই, সাড়ে-চারটে বেজে গেছে। ওঁরা বোধ করি বড্ড ব্যস্ত হচ্ছেন—এই বলে সে একরকম তাকে জোর করে বিদায় কোরে দিলে।

অরুণ সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে নামতে জিজ্ঞাসা করলে, আপনি কতদিন পশ্চিমে থাকবেন ক্ষিতীশদা?

সে কথা আজ কি কোরে বলব ভাই?

মিনিট-খানেক পরে অরুণ গিয়ে যখন গাড়িতে উঠে বোসলো, তখন তাকে একাকী দেখে কমলা কোন প্রশ্নই করলে না, কিন্তু হরেন জিজ্ঞাসা করলে, ক্ষিতীশ এলো না অরুণ–

তার জবাবটা ক্ষিতীশ নিজেই দিলে। সে উপরের বারান্দায় রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বললে, শরীরটা আমার ভাল নেই হরেন, আর ঠাণ্ডা লাগাবো না।

হরেন একটু উদ্বিগ্ন হয়ে বললে, ভাল নেই? তাহলে হিমে আর দাঁড়িয়ো না ক্ষিতীশ, ঘরে যাও, আমি এদের পৌঁছে দিয়ে এসে তোমাকে জানাবো।

মোটর ছেড়ে দিলে। হরেনের উপদেশ তার কানে গেল কিনা কে জানে, কিন্তু গাড়ি যখন বহুক্ষণ তার চোখের বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল, তখনও সে তেমনি সেই দিকে চেয়ে তেমনি স্তব্ধ হয়েই দাঁড়িয়ে রইল।

স্টেশনে পৌঁছে, টিকিট কিনে দু'জনকে গাড়িতে তুলে দিয়ে হরেন কমলার কাছে গিয়ে একটুখানি লজ্জার সঙ্গে বললে, আমার উপস্থিত ঠিকানা যদিচ আমি নিজেই জানিনে, তবুও আমাকে খবর দেবার যদি আবশ্যক হয় ত কেয়ার অফ্–

অরুণ পকেট থেকে তাড়াতাড়ি এক টুকরো কাগজ আর পেন্সিল বার করে বললে, থামো থামো হরেনদা, ঠিকানাটা তোমার লিখে নিই। তাছাড়া শুনলুম, ক্ষিতীশদাও আজ দুপুরের ট্রেনে পশ্চিমে চলে যাচ্ছেন। এটা ছাই মনে হোলো না যে তাঁর ঠিকানাটা জিজ্ঞেসা কোরে রাখি।

সংবাদ শুনে কমলা মনে মনে আশ্চর্য হলো, কিন্তু কিছুই প্রকাশ করলে না। কিন্তু হরেন উদ্বিগ্ন হয়ে বলে উঠলো, বলিস কি অরুণ! তাহলে ত আমাকে এখুনি ফিরে গিয়ে তাকে থামাতে হয়!

কমলা মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলে, কেন হরেনদা?

অরুণ বললে, কেন কি, বাঃ–

হরেন বললে, সেখানে কত কি ঘটতে পারে কে বলতে পারে? অন্যায় হলে আমি ত যাবই, এমন কি ক্ষিতীশকে পর্যন্ত ধরে নিয়ে যেতে ছাড়বো না! তুই কি আমাকে ভীরু মনে করিস?

কমলা ঘাড় নেড়ে বললে, না, তা করিনে। কিন্তু তোমাদের কারও সেখানে আমার জন্যে যাবার দরকার হবে না।

হরেন ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে বললে, হবে না? নাই হোক, কিন্তু আজও কি তুই আমাদের পাড়াগাঁয়ের লোকগুলোকে চিনিস নি কমলা?

কমলা এ প্রশ্নের ঠিক জবাব দিলে না, বললে, আমি কিছুতে ভেবে পাইনে হরেনদা, এতদিন কি করে আমার সমস্ত বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছিল, আর কেমন করেই বা এতদিন নিজের কাজের ভার তোমাদের পরের ওপর নির্ভর করে থাকতে পেরেছিলুম। ভুল যা করেচি তার সীমা নেই, কিন্তু তোমাদের সাক্ষী দিতে ডেকে পাঠাবো এত বড় ভুল বোধ হয় আমিও আর কোরবো না।–এই বলে সে ছোটভাইয়ের হাত থেকে কাগজের টুকরোখানি নিয়ে জানালা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিলে।

হরেন মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ এবং লজ্জিত হয়ে বললে, কিন্তু কমলা, নির্দোষীকেও কি সাক্ষী দিয়ে নিজের নির্দোষিতা প্রমান করতে হয় না?

কমলা একটুখানি ম্লান হেসে বললে, সে আদালতে হয়, কিন্তু আমার বিষয়ের ভার যাঁর হাতে তুলে দিয়েচি হরেনদা, তাঁকে সাক্ষী যোগাতে হয় না, তিনি আপনিই সব জানেন।

এই বোলে সে উদ্গত অশ্রু গোপন করতে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিলে।

গার্ডসাহেব সবুজ নিশান নেড়ে দিলেন, ড্রাইভার বাঁশী বাজিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিলে। এই সময়টুকুর মধ্যে হরেন যেন একটা ধাক্কা সামলে নিলে। সে সঙ্গে সঙ্গে দু'পা এগিয়ে এসেও কমলার মুখ আর দেখতে পেলে না, কিন্তু তাকেই উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে বললে, তাই যেন হয় বোন, আমি কায়মনে প্রার্থনা করি তিনিই যেন আমাদের বিচারের ভার গ্রহণ করেন।

কমলা এ কথার কোন উত্তর দিল না, দেবার ছিলই বা কি! কিন্তু গাড়ি কতকটা পথ চলে গেলে সে কেবলমাত্র একটিবার জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে পেলে হরেন এখনও সোজা তাদের দিকেই চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পথের মধ্যে অরুণ অনেক কথাই বকে যেতে লাগল। তার নিজের প্রতি ভারী একটা ভরসা ছিল। সেই যে দুর্গামণি তাকে বলেছিলেন, তিনি গুজবটা বিশ্বাস করেন নি, এবং সেও তাকে জানিয়ে এসেছে, কলকাতায় দিদি তার কাছেই আছেন, এতেই তার সাহস ছিল, দুর্ঘটনাটাকে সে অনেকখানিই সহজ করে দিয়েছে। এই ভাবের সান্ত্বনাই সে থেকে থেকে দিদিকে দিয়ে যেতে লাগলো, কিন্তু দিদি যেমন নিঃশব্দে ছিল, তেমনি নীরবেই বসে রইল। হরেনের সেই কথাটা সে ভোলেনি যে অরুণের এই কথাটা সহজে কেউ বিশ্বাস করবে না! কিন্তু এজন্য মনের মধ্যে তার বিশেষ কোন চাঞ্চল্যও ছিল না। বস্তুতঃ যা সত্য নয়, সে যদি লোকে অবিশ্বাসই করে ত দোষ দেবার কাকে কি আছে! কিন্তু যথার্থ যে-চিন্তা তার মনের মধ্যে ধীরে ধীরে জাঁতার মত চেপে বসছিল, সে তার শাশুড়ীর কথা। তিনি বলেছিলেন বটে, তাঁর বধূর কলঙ্ক তিনি বিশ্বাস করেন না, কিন্তু এই বিশ্বাস কি তাঁর শেষ পর্যন্ত অটুট থাকবে? কোথাও কি কোন অন্তরায় কোন বিঘ্ন ঘটবে না? সে জানতো, ঘটবে। পল্লীগ্রামে মানুষ হয়েই সে এত বড় হয়েছে, তাদের সে চেনে,–কিন্তু এ সংকল্পও তার মনে মনে একান্ত দৃঢ় ছিল, অনেক ভুল, অনেক ভ্রান্তিই হয়ে গেছে, কিন্তু

আর সে তার নিজের এবং স্বামীর মধ্যে তৃতীয় মধ্যস্থ মানবে না। এ সম্বন্ধ যদি ভেঙ্গেও যায় ত যাক্, কিন্তু জগদীশ্বর ভিন্ন দুজনের মাঝখানে অন্য বিচারক সে কখনো স্বীকার করবে না।

বেলতলী স্টেশনে যথাসময়েই ট্রেন এসে পৌঁছল, কিন্তু ঘোড়ার গাড়ি যোগাড় করা সহজ হোলো না। অনেক চেষ্টায় অনেক দুঃখে অরুণ যখন একটা সংগ্রহ করে নিয়ে এল, তখন বেলা হয়েছে, এবং পল্লীপথের পাকা দুই ক্রোশ উত্তীর্ণ হয়ে অশ্বযান যখন জগদীশপুরের সতীশ বাগচীর বাটীর সুমুখে উপস্থিত হল তখন বেলা বারোটা।

দুর্গামণি গোটা-তিনেক ময়লা ওয়াড়হীন তুলো-বার-করা বালিশ জড়ো করে ঠেস দিয়ে বসে এক বাটি গরম দুধ পান করছিলেন, এবং অদূরে মেঝেয় বসে পাড়ার একটি বিধবা মেয়ে কুলোয় খৈয়ের ধান বাচছিল। দুর্গামণির জ্বর তখনও একটু ছিল বটে, কিন্তু টাইফয়েডের কোন লক্ষণই নয়। তিনি অরুণকে দেখে খুশী হয়ে বললেন, কে অরুণ এসেছো বাবা? এসো বোসো। দোরগোড়ায় ও কে গা?

দিদি এসেছেন–

দিদি? কে বউমা?

পরক্ষণেই কমলা ঘরে ঢুকে গলায় আঁচল দিয়ে ভূমিতলে গড় হয়ে প্রণাম করতেই দুর্গামণি শশব্যস্ত হয়ে উঠ্লেন। দুধের বাটিটা মুখ থেকে নামিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন–থাক থাক, বউমা, আর পায়ের ধূলো নিতে হবে না। সারাদিন পরে দুধ ফোঁটাটুকু মুখে তুলেচি, এটুকু আর ছুঁয়ে দিয়ো না।

যে মেয়েটি খৈ বাচছিল সে স্পর্শ বাঁচিয়ে কুলোসমেত দু'হাত সামনে এগিয়ে গেল। কমলা নির্বাক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু অরুণ যেন একেবারে অগ্নিকাণ্ডের ন্যায়

জ্বলে উঠে বলে ফেল্‌লে—মিথ্যেবাদী! কেন তবে কাল তুমি বললে, ও-সব গুজবে তুমি বিশ্বাস করো না! কেন বললে—

শোন কথা! কবে আবার বললুম বিশ্বেস করিনে? আর জ্বরের ধমকে যদি কিছু বলেই থাকি ত সে কি আমার ধর্তব্যি, বাছা!

অরুণ কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললে, তা হলে ত আমি কখখনো দিদিকে আনতুম না। দুর্গামণি দুধের বাটিটি সরিয়ে একটু নিরাপদ স্থানে রেখে বললেন, তা বেশ ত বাছা, অমন মারমুখী হোচ্চো কেন? সাঙ্গেল মশাই আসুন, রায় বট্‌ঠাকুরকে খবর দি,—ততক্ষণ ঘরে সবই আছে, পটলের মা বের কোরে দিক্—দোরের উনুনটায় বোক্‌নোয় করে ডাল-চাল দুটো ফুটিয়ে তোমাকেও দুটো দিক্, নিজেও দুটো খাক।

অরুণ চতুর্গুণ জ্বলে উঠে বললে, কি! আমরা তোমার বাড়ি ভিক্ষে নিতে এসেচি। এত বড় কথা বল তুমি! আচ্ছা, টের পাবে! এই বোলে সে কমলার হাতখানা চেপে ধরে বললে, চল দিদি, আমরা যাই,—এখনো আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে—এক মিনিটও এর মুখ দেখতে চাইনে।

কমলা ধীরে ধীরে নিজের হাতখানি মুক্ত করে নিয়ে বললে, চল, যাচ্চি ভাই। তারপরে মাথার আঁচলটা সরিয়ে দিয়ে শাশুড়ীর মুখের পানে চেয়ে শান্ত সহজ কণ্ঠে বললে, মা আমি চললুম, কিন্তু আমিও এ বাড়ির বউ, তোমারি মত এও আমার শ্বশুরের ভিটে। কিন্তু এমন অপরাধ আজও করিনি যাতে এ বাড়িতে আমাকে দোরের উনুনে রেঁধে খেতে হয়।

শাশুড়ী বললেন—তা কি জানি বাছা!

কমলার মলিন চোখের দৃষ্টি হঠাৎ শিখার মত দীপ্ত হয়ে উঠল—বোধ হয় কি যেন সে বলতেই চাইলে, কিন্তু সে অবসর আর পেলে না। অরুণ বজ্রমুষ্টিতে হাত ধরে জোর করে তাকে নিয়ে বাইরে চলে গেল।